গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ১৫ সংখ্যা | ১৯ - ২৫ নভেম্বর ২০২১ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

মহান লেনিন-স্ট্যালিনের ছবি নিয়ে

নভেম্বর বিপ্লব দিবসে রাশিয়ায় বিশাল মিছিল

৭ নভেম্বর মহান নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ১০৫তম স্মরণদিবসে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে পথে নামেন হাজার হাজার মানুষ। সমাজতন্ত্রের রূপকার লেনিন এবং তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি স্ট্যালিনের ছবি ও রক্তপতাকা হাতে নিয়ে মিছিলে সামিল হন ছাত্র-যুব-মহিলা-প্রবীণ মানুষেরা। মস্কোর রেড স্কোয়ারে লেনিন মুসোলিয়ামে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পর মিছিল কার্ল মার্কস স্মারক পর্যন্ত যায়। (আরও ছবি পাঁচের পাতায়)

‘রাষ্ট্র ঃ শ্রেণিবিরোধের অনিরসনীয়তার ফল— লেনিন (পাঁচের পাতায়)

এক বছরে অপুষ্ট শিশু বেড়েছে ৯১ শতাংশ

অর্থনীতি নাকি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে!

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রভাব কাটিয়ে দেশের অর্থনীতি ‘ঘুরে দাঁড়াচ্ছে’ বলে দাবি করে চলেছে বিজেপি সরকার। অর্থনীতি নাকি আবার ছন্দে ফিরবে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারেরই নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, দেশে ৩৩ লক্ষ শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। এর মধ্যে ভয়ানক অপুষ্টির শিকার প্রায় ১৬ লক্ষ শিশু। ২০২০-র নভেম্বর থেকে থেকে গত এক বছরে ভয়াবহ অপুষ্টিতে ভুগতে থাকা শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৯১ শতাংশ।

সরকার পরিচালনায় বিজেপির দক্ষতা নিয়ে প্রশ্নের কোনও অবকাশ নেই বলে বিজেপি নেতাদের দাবি। কিন্তু যে আর্থিক বৃদ্ধির কথা তাঁরা বলছেন, তা কি দেশের সাধারণ মানুষের? তা যদি হয় তবে তো তাদের জীবনমানের উন্নতি ঘটবে! তাহলে দেশে শিশু-অপুষ্টির এই ভয়াবহ চেহারা কেন?

> **“ দেশে ৩৩ লক্ষ শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। এর মধ্যে ভয়ানক অপুষ্টির শিকার প্রায় ১৬ লক্ষ শিশু। ২০২০-র নভেম্বর থেকে থেকে গত এক বছরে ভয়াবহ অপুষ্টিতে ভুগতে থাকা শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৯১ শতাংশ।**

বিশ্ব ক্ষুধা তালিকায় ভারত ক্রমাগত লজ্জাজনক জায়গায় চলে যাচ্ছে। গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স ২০২১-এ অপুষ্টিতে ভারতের স্থান ১১৬টি দেশের মধ্যে ১০১তম, ২০২০-তেও যা ছিল ৯৪। ভারত রয়েছে অপুষ্টির ‘সিরিয়াস’ ক্যাটাগরিতে। প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপালেরও পিছনে রয়েছে ভারত। এমনকি মানচিত্রে এক চিলতে জায়গা পাওয়া দারিদ্র্যপীড়িত দেশ ইথিওপিয়া, কেনিয়া, মঙ্গোলিয়া, মায়ানমার, ভিয়েতনাম ইত্যাদির সঙ্গে ‘শক্তিধর অর্থনীতি’র ভারত প্রতিযোগিতায় রয়েছে যাতে শেষের দিক থেকে প্রথম হয়ে না যায়!

চারটি সূচক দিয়ে নির্ধারিত হয় ‘বিশ্ব ক্ষুধা’ তালিকা। শিশুদের প্রয়োজনীয় পরিচর্যার অভাব, ক্ষীণকায় শিশু, খর্বাকৃতি শিশু এবং শিশুমৃত্যুর হার— সব ক’টির সাথেই যুক্ত মারাত্মক অপুষ্টি। এই সবগুলিতেই ব্যর্থতার কালি মেখেছে ভারত সরকার। এই ভয়াবহ অপুষ্টির কারণ কী? দেশে

সাতের পাতায় দেখুন

‘না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা’

বাস্তবে খেয়েছেন, খাওয়ার ব্যবস্থাও করেছেন

রাফাল দুর্নীতি

ফরাসি সংবাদ সংস্থা ‘মিডিয়াপার্ট’ হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে চলা কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের। ৮ নভেম্বর সংবাদ সংস্থাটির প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের অধীনে থাকা সিবিআই এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে থাকা ইডি ২০১৮ সালের ১১ অক্টোবরেই সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পেয়েছিল যে, রাফাল যুদ্ধ বিমান কেনার জন্য বিপুল পরিমাণ ঘুষের লেনদেন হয়েছিল। কিন্তু এই প্রমাণ হাতে পেয়েও দুটি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাই হাত গুটিয়ে থেকেছে। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্লোগান দিয়েছিলেন, ‘না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা’। দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি নাকি এমনই এক সৈনিক! কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, আড়ালে আড়ালে শুধু নিজের খাওয়া নয়, অন্যদের খাওয়ার বন্দোবস্তও করে রেখেছে তাঁর সরকার।

বিজেপিরই দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অরুণ শৌরি এবং যশবন্ত সিনহা ২০১৮-র অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহের আশেপাশে রাফাল বিমান কেনায় দুর্নীতি সংক্রান্ত ফাইল তৎকালীন সিবিআই ডিরেক্টর অলোক বর্মার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তার কয়েকদিন বাদে মরিশাসের অ্যাটর্নি জেনারেল ভারত সরকারকে জানিয়েছিলেন, সে দেশে নথিভুক্ত ভুয়ো কোম্পানির মাধ্যমে ঘুষের আদানপ্রদান হয়েছে। কিন্তু ঠিক তার পরেই সিবিআই ডিরেক্টরকে মাঝরাতে অপসারণ করা হয়, তাঁর অফিসে তল্লাশি চালানো হয়। তারপর থেকে এই তদন্ত পুরোপুরি ধামাচাপা পড়ে যায়।

মিডিয়াপার্ট জানিয়েছে, ভারতীয় দালাল সুষেণ গুপ্ত ‘ইন্টারস্টেলার টেকনোলজিস’ নামে একটি ছদ্ম কোম্পানি খুলে তা মরিশাসে নথিভুক্ত করায়। ২০০২ সাল থেকেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর অস্ত্র কেনাবেচার টেন্ডারগুলিতে বিদেশি কোম্পানিগুলির সাথে লেনদেনে এই

দুয়ের পাতায় দেখুন

নয়া বিদ্যুৎ বিল বাতিলের দাবিতে

মধ্যপ্রদেশে ব্যাপক আন্দোলন

এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে বিদ্যুৎ সমস্যা নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন চলছে মধ্যপ্রদেশে। বিদ্যুতের দাম বাড়ানো বন্ধ করা, বিদ্যুৎ বিল (সংশোধনী) ২০২১ বাতিল করা, বিদ্যুতের বেসরকারিকরণ বন্ধ করা প্রভৃতি দাবিতে ১২ নভেম্বর গুনা, গোয়ালিয়র, ভোপাল, অশোকনগর (ছবি), দেবাস, সাগর সহ বিভিন্ন জেলায় এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখান বিদ্যুৎগ্রাহকরা। ১০ থেকে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত দলের সর্বভারতীয় কমিটি বিদ্যুৎ নিয়ে সর্বভারতীয় প্রতিবাদ পক্ষ পালনের আহ্বান জানিয়েছে।

সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ দিন সারা মধ্যপ্রদেশে দাবি দিবস পালিত হয়। মানুষ ব্যাপক সমর্থন জানায়। বিদ্যুতের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবায় পুঁজিমালিকদের স্বার্থবাহী সরকারের অন্যায় আক্রমণ রোখার লক্ষ্যে সারা দেশের মতো মধ্যপ্রদেশেও বিভিন্ন শহরে বিদ্যুৎ আন্দোলনের কমিটি গঠনের কাজে দলের পক্ষ থেকে জোর দেওয়া হয়েছে।

বাস্তবে খেয়েছেন খাওয়ার ব্যবস্থাও করেছেন

একের পাতার পর

কোম্পানি মধ্যস্থতার কাজ করতে থাকে। তারা কাটমানির সাহায্যে ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ কর্তাদের হাত করে সেনাবাহিনীর অর্ডার ধরে দিতে ইউরোপের অস্ত্র কোম্পানিগুলিকে সাহায্য করতে থাকে।

সে সময় দেশে ছিল অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রীত্বে চলা বিজেপি সরকার। পরবর্তীকালে কংগ্রেস সরকারের আমলেও একই ভাবে দালালি চলতে থাকে। নরেন্দ্র মোদী সরকারের আমলে তা আরও প্রকট হয়েছে।

ভারতবাসী মাত্রেই জানে বোফর্স কামানই হোক বা অন্য কোনও সামরিক অস্ত্র, বিমান, হেলিকপ্টার ইত্যাদি কেনাবেচায় দালালচক্র দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয়। এই ইন্টারস্টেলার কোম্পানিও একই কাজ করত। এই ধরনের কোম্পানি কেবলমাত্র টাকা লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে বলে এদের বলা হয় 'শেল কোম্পানি'। ইন্টারস্টেলার কোম্পানি কয়েক দফায় ব্যাঙ্কের ভুয়ো ইনভয়েস তৈরি করে ৭৫ লক্ষ ইউরো (৬৪ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা) ২০১২ সালে ঘুষ হিসাবে দিয়েছে। মিডিয়াপার্টের তদন্ত অনুসারে রাফাল নির্মাতা দাসো অ্যাভিয়েশন কোম্পানি এই দালালের মাধ্যমে কমপক্ষে ১১০ কোটি টাকা কাটমানি ভারতীয় কর্তাদের দিয়েছে। তার বলেই তারা রাফাল বিমান বিক্রির অর্ডার পেয়েছে। ভারতীয় কর্তাদের ঘুষ দিয়ে সুষেণ গুপ্তারা প্রতিরক্ষা দপ্তরের গোপন নথিও পেয়ে গিয়েছিল। ফলে দরকষাকষির সময় ভারতীয় কর্তারা মুখ খোলার অনেক আগেই দাসো কোম্পানি তার ছক সাজিয়ে নিতে পেরেছিল। ফলে তারা এক্ষেত্রে ভারত সরকারের থেকে বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল এবং তাদের সুবিধা দেখেই চুক্তিটি হয়েছে। মরিশাসের অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছ থেকে এমন ভুয়ো ইনভয়েস ও ফাঁস হওয়া প্রতিরক্ষা নথির সুনির্দিষ্ট তথ্যই পেয়েছিল সিবিআই এবং ইডি। এই সংবাদ সংস্থার তদন্ত দেখিয়েছে একই কায়দায় ইতালির ফিনমোনিকা কোম্পানির তৈরি অগুস্তা হেলিকপ্টার কেনার জন্যও সুষেণ গুপ্তার কোম্পানির মাধ্যমে কাটমানি বা ঘুষের লেনদেন হয়েছে।

যদিও কাটমানি ও টেবিলের তলার লেনদেন এখানেই শেষ নয়। ২০১২ সাল পর্যন্ত এই কাটমানির প্রমাণ হাতে পেয়েও বিজেপির সরকারের শীর্ষ কর্তারা কেন চুপ রইলেন সেটাও মোটেই আশ্চর্যের নয়! ওই সময়কার কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির এতবড় প্রমাণ পেয়েও খোদ প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তর সিবিআই ও ইডিকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে বসিয়ে রাখল কেন? কেঁচো খুঁড়তে আরও বড় কেউটে বেরনোর সম্ভাবনা থেকেই?

আসলে রাফাল বিমান কেনার চুক্তির সবচেয়ে সন্দেহজনক পর্যায় হল ২০১৫ সালের

কংগ্রেস বিজেপির মধ্যে তরজা চলছে, কে কত বেশি কাটমানি খেয়েছে তা নিয়ে। এদিকে রাফাল দুর্নীতির অভিমুখ পৌঁছে গেছে প্রধানমন্ত্রীর দোরগোড়ায়। এই দুর্নীতির তদন্ত ও অভিযুক্ত দোষী নেতা-মন্ত্রী-সেনাকর্তাদের শাস্তিতে সরকারকে বাধ্য করতে হলে প্রবল জনমত গড়ে তোলা দরকার।

পর থেকে। যে সময় প্রধানমন্ত্রী সহ বিজেপি সরকারের একেবারে শীর্ষ কর্তাদের হস্তক্ষেপে দীর্ঘ সময় ধরে দরাদরির পর প্রায় চূড়ান্ত চুক্তিটি অদ্ভুতভাবে বদলে যায়। ১২৬টির জায়গায় বিমানের সংখ্যা কমে হয় মাত্র ৩৬। অন্যদিকে প্রতিটি বিমানের দাম ৫২৬ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৬৭০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আগের চুক্তিতে ছিল দাসো কোম্পানি ১৮টি বিমান দেবে সম্পূর্ণ তৈরি অবস্থায়। আর রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি হিন্দুস্তান এরোনটিক্স লিমিটেড (হ্যাল) দাসোর অফসেট পার্টনার হিসাবে ভারতেই ১০৮টি এই বিমান তৈরি করবে। বিমান রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এবং প্রযুক্তিও পাবে হ্যাল। কিন্তু ২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে রিলায়েন্স কর্তা অনিল আম্বানিকে সাথে নিয়ে ফ্রান্সে গিয়ে সেখানকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ওলান্দের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করেন। সেই সময় অফসেট পার্টনারের স্থানে হ্যালকে আকস্মিকভাবে সরিয়ে দিয়ে আম্বানি সাহেবের সদ্যোজাত কোম্পানি 'রিলায়েন্স ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিজ' চলে আসে। ২০১৮ সালে প্রাক্তন ফরাসি প্রেসিডেন্ট একাধিকবার বলেন, হ্যালের বদলে আম্বানির কোম্পানিকে বেছে নেওয়ার জন্য ফরাসি সরকার বা দাসো কোম্পানি দায়ী নয়। ভারত সরকারের (পড়ুন প্রধানমন্ত্রী) অনুরোধেই এই পরিবর্তন। শুধু তাই নয় ভারত সরকারের অবস্থানের জন্যই রাফাল চুক্তিতে যে দুর্নীতি বিরোধী ধারা ছিল তা মুছে দিতে পেরেছিল দাসো কোম্পানি এবং তার নিযুক্ত দালালরা। ভারতীয় 'দেশপ্রেমিক' সেনা কর্তা, আমলা, মন্ত্রী, এমনকি প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে রক্ষাকবচটাই তুলে দিয়ে এসেছেন।

পুঁজিবাদী বাজারের তীব্র সংকট থেকে বাঁচতে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণি ক্রমাগত অর্থনীতির সামরিকীকরণের পথে গেছে। বর্তমান সর্বাত্মক বাজার সংকটকে মোকাবিলা করার জন্য তাদের হাতে একমাত্র হাতিয়ার যুদ্ধাস্ত্রের কারবার। একই সাথে যুদ্ধাস্ত্রের কারবার যত বাড়ছে তত পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তা নিয়ে দুর্নীতির কারবার। দেশের নেতা-মন্ত্রীরা জনগণকে বোঝান দেশ রক্ষার জন্য সামরিক বাহিনীকে আরও অস্ত্র দিতে হবে, তাই দেশের সমস্ত সম্পদ ঢেলে হলেও আরও মারণাস্ত্র কিনতে হবে। এই ব্যবসার মধ্য দিয়ে পুঁজিপতি শ্রেণির মুনাফার পাহাড় আরও উঁচু হয়। আর নেতামন্ত্রী-আমলা-সেনাকর্তারা কমিশন খেয়ে পকেট ভারি করেন। খাঁচার তোতা সিবিআই সে কারণেই টুঁ শব্দটি করতে সাহস করেনি একথা নিশ্চিত। কংগ্রেস বিজেপির মধ্যে তরজা চলছে, কে কত বেশি কাটমানি খেয়েছে তা নিয়ে। এদিকে রাফাল দুর্নীতির অভিমুখ পৌঁছে গেছে প্রধানমন্ত্রীর দোরগোড়ায়। এই দুর্নীতির তদন্ত ও অভিযুক্ত দোষী নেতা-মন্ত্রী-সেনাকর্তাদের শাস্তিতে সরকারকে বাধ্য করতে হলে প্রবল জনমত গড়ে তোলা দরকার। পুঁজিবাদী দলগুলি সকলেই কোনও না কোনও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকায় তাদের সক্রিয়তা আজ দুরাশা। ফলে নাগরিক সমাজকেই এ ব্যাপারে সক্রিয় উদ্যোগ নিতে হবে।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) হলদিয়া লোকাল কমিটির প্রবীণ কর্মী কমরেড সুকেশ কালসা দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর ৩ নভেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের বাসুদেবপুরে নিজ বাসভবনে প্রয়াত হন। বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময় হলদিয়া শিল্পাঞ্চলে বাসুদেবপুর সার কারখানার জন্য রিজার্ভার গড়তে জমি অধিগ্রহণ করার সময় এলাকার মানুষ গণকমিটি গড়ে তুলে আন্দোলন করেছিল উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও চাকরির দাবিতে। কমরেড সুকেশ কালসা এস ইউ সি আই (সি) দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন এবং দলের নানা দায়িত্ব পালন করেন। পারিবারিক অভাব-অনটনের কারণে তিনি ধারাবাহিক ভাবে দলের কাজে থাকতে পারেননি। কিন্তু এত দারিদ্র্যের মধ্যেও কারও কাছে করুণার পাত্র হওয়ার কথা তিনি ভাবতেও পারেননি। শত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও দলের আদর্শে অবিচল থাকার সংগ্রাম তাঁর ছিল। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে দলের কর্মী-সমর্থক সহ বহু মানুষ শ্রদ্ধা জানান। দলের পক্ষ থেকে কমরেডস শ্রীকেশ প্রামাণিক, অলকেশ বেতাল, তপন দাস শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

কমরেড সুকেশ কালসা লাল সেলাম

মাস্টার প্ল্যান কার্যকর করার দাবিতে আন্দোলনে ঘাটালবাসীরা

কেন্দ্রে কত দল এল, কত দল গেল। প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়ে গেল। কিন্তু ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে অর্থ বরাদ্দ করে মেদিনীপুরকে বন্যার কবল থেকে বাঁচাতে বাস্তবে কারও কোনও উদ্যোগ নেই। ক্ষুব্ধ মানুষ। তাই আগামী বর্ষার পূর্বেই শিলাবতী নদী এলাকায় কাজ শুরুর দাবিতে বরদা চৌকান থেকে ঘাটাল পর্যন্ত পদযাত্রার ডাক দিয়েছে। গত বর্ষায় ঘাটাল মহকুমার বিরাট অংশ ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছিল। ঘরবাড়ি-ফসলের ক্ষতি-প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে। এবারকার বন্যার ভয়াবহতা লক্ষ করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও হেলিকপ্টার চড়ে এসেছিলেন ঘাটালে।

এসেছিলেন সেচ ও জলপথ দপ্তরের মন্ত্রী, জলসম্পদ অনুসন্ধান দপ্তরের মন্ত্রী, সেচ দপ্তরের প্রধান সচিব। এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারের টিমও এলাকা পরিদর্শনে এসেছিল। সরকারি টাকায় আকাশ ভ্রমণ হল। কিন্তু প্রকল্পের জন্য অর্থ মঞ্জুর করার বিষয়ে এখনও কোনও বাক্য উচ্চারিত হল না। এমতাবস্থায় মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি এক জরুরি সভায় উপরোক্ত দাবিতে আন্দোলনকে তীব্রতর করতে আগামী ২২ নভেম্বর বরদা চৌকান থেকে ঘাটাল পর্যন্ত পদযাত্রার কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। সভায় উপস্থিত ছিলেন কমিটির সভাপতি ডাঃ বিকাশ চন্দ্র হাজরা, যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, দেবাশিষ মাইতি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

প্রতিবন্ধী হাসপাতালের মান অবনমনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

বরানগরের বনহুগলির প্রতিবন্ধী হাসপাতাল ও গবেষণা কেন্দ্রটিকে ওড়িশার অনুরূপ একটি গবেষণাকেন্দ্রের শাখা প্রতিষ্ঠানে অবনমিত করার প্রতিবাদে ১৫ নভেম্বর বিক্ষোভ দেখানো হয়। এনআইওএইচ বাঁচাও কমিটি, নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ এবং প্রতিবন্ধী ঐক্যমঞ্চ এই বিক্ষোভের ডাক দেয়। চিকিৎসক, আইনজীবী, সমাজকর্মী সহ তিন শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। আইনজীবী কার্তিক কুমার রায় ও চিকিৎসক ছোটন দাস রাজ্যপালের কাছে প্রতিবাদী স্মারকলিপি জমা দেন। মঞ্চের আহ্বায়ক ডাঃ অমিত ধবল বলেন, অতি দ্রুত এই কালা সার্কুলার প্রত্যাহার না করলে সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে বৃহত্তর আন্দোলন, প্রয়োজনে ঘেরাও আন্দোলন হবে। তাঁরা প্রতিবন্ধীদের সনাক্তকরণের জন্য ব্লক স্তরে ক্যাম্প, প্রয়োজনীয় সহায়ক সরঞ্জাম সহ ৭ দফা দাবি তুলে ধরেছেন।

বিজেপিবিরোধী ক্ষোভ জনবিরোধী নীতির কারণেই

বিজেপির জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক অনুষ্ঠিত হল নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী সহ অন্যান্য নেতাদের বক্তব্যে উঠে এসেছে উত্তরপ্রদেশ সহ পাঁচ রাজ্যে ভোটের আগে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের প্রতি মানুষের বিশ্বাসের পারদ ক্রমাগত নামছে। তাই আস্থা ফেরাতে দলীয় কর্মীদের দ্রুত মাঠে নামাতে নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রশ্ন হল, এখন না হয় বিজেপির প্রতি আস্থা কমছে। কিন্তু মাত্র কয়েক বছর আগে ২০১৪ সালে বিজেপি বিপুল ভোটে জিতে কেন্দ্রে সরকার দখল করেছিল কী করে? সেই সময় কি তারা নিজেদের কার্যকলাপের মাধ্যমে দেশের মানুষের আস্থাভাজন হয়ে উঠেছিল? তা একেবারেই নয়। তা হলে বিজেপি জিতল কী করে? বিজেপি ২০১৪ সালে জিতেছিল কংগ্রেসবিরোধী তীব্র ক্ষোভ থেকে। কংগ্রেসের দশ বছরের চূড়ান্ত জনবিরোধী শাসনে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিষ্ঠানবিরোধী মানসিকতা থেকে মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়েছিল। একচেটিয়া পুঁজিপতিরা মানুষের ক্ষোভকে তাদের বিশ্বস্ত আর একটি দলের দিকে চালিত করতে মাঠে নেমেছিল। তাদের ভয় ছিল এই ক্ষোভ বিপথগামী না করতে পারলে তা মানুষকে আন্দোলনে নিয়ে যাবে। তাই তারা টাকার থলি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল বিজেপির পাশে। প্রচার দিয়ে টাকার শক্তি দিয়ে প্রশাসনকে কবজা করে বিজেপিকে জেতাতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাতে প্রভাবিত হয়েছিল জনমত। এর মধ্যে বিজেপির প্রতি জনগণের গভীর আস্থার কোনও বিষয়ই ছিল না। যে ১৫-১৬টি রাজ্যে বিজেপি জিতেছে সেখানেও কাজ করেছে একই কারণ।

কিন্তু মানুষের জীবন তো শুধু ভোটের অঙ্কে চলে না, কে সরকারে এল আর কে গেল তার দ্বারাও চলে না। তাকে অর্থনীতির নিয়মাধীনে বাজারে কেনাকাটা করতে হয়, খাবার জোগাড় করতে হয়। সে জন্য রোজগার করতে হয়। সেখানে তাকে পড়তে হচ্ছে কঠিন পরিস্থিতির সামনে। আর তখনই সরকারের বিরুদ্ধে তৈরি হচ্ছে একরাশ ক্ষোভ-বিক্ষোভ, সেই বিক্ষোভ ফেটেও পড়ছে দেশের নানা প্রান্তে।

সরকারের কাছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা কী? তারা চান সরকার এমনভাবে শাসন পরিচালনা করুক, যাতে মানুষ সুস্থ ভাবে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু বাস্তবে দেশে আজ কোথাও সে পরিস্থিতি নেই। দেশের সিংহভাগ মানুষের স্থায়ী চাকরির সংস্থান নেই। স্থায়ী রোজগার নেই। নিত্যব্যবহার্য প্রতিটি জিনিসের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। ভোজ্য তেলের দাম মোদি শাসনে দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। গ্যাসের দাম হাজার টাকা ছুঁইছুঁই। গ্যাসে যে ভর্তুকি দেওয়া হত, নানা শ্রুতিমধুর বাকচাতুর্যের আড়ালে তা তুলে দেওয়া হয়েছে। শীঘ্রই কেন্দ্রীয় রেশন বন্ধ করে দেবে বলছে। সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সঙ্কট কমানোর পরিবর্তে, সরকার একের পর এক জনবিরোধী নীতির দ্বারা বাড়িয়েই চলেছে। মানুষ এই অবস্থায় সরকারের প্রতি আস্থাহীন না হয়ে পারে?

এসব প্রশ্ন তুললেই বিজেপি নেতারা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার তো মানুষকে আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে। কেমন সে সাহায্য? বিজেপি বলছে, বিনে পয়সায় চিকিৎসার জন্য 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্প আনা হয়েছে, কৃষকদের অ্যাকাউন্টেডাইরেক্টটাকা পাঠানো হচ্ছে। অর্থাৎ, অনেকটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর 'স্বাস্থ্যসাথী' বা 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' বা 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্পের মতো। কিন্তু মানুষ বাস্তবে কী চান? মানুষ চান নিজেদের আর্থিক সমৃদ্ধি, নিজস্ব স্থায়ী রোজগার, যাতে অন্যের দয়া ভিক্ষার উপর বা সরকারের অনুদানের উপর বাঁচতে না হয়। এই স্বনির্ভরতার উপর কেন্দ্রীয় সরকার মারাত্মক আঘাত হেনেছে।

সরকারি উদ্যোগে স্থায়ী চাকরির সুযোগ ক্রমাগত কমানো হচ্ছে। নতুন পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে না। বিপরীতে পদ বিলোপ চলছে। স্থায়ী চাকরিগুলোকে অস্থায়ী, চুক্তি নির্ভর করে দিচ্ছে। শ্রম আইনের সংস্কার করে কাজের ঘন্টা বাড়াচ্ছে, মজুরি কমাচ্ছে। মানুষ ভাল থাকবে কী করে?

এমন একটি বিদ্যুৎ আইন সরকার আনতে চলেছে যেখানে শিল্প মালিকদের বিদ্যুৎ মাশুল কমবে, বাড়বে সাধারণ মানুষের। পারস্পরিক ভর্তুকি তুলে দিয়ে এই আক্রমণ নামিয়ে আনছে। বিদ্যুৎকে পুরোপুরি তুলে দিচ্ছে বেসরকারি হাতে। যে কৃষিবিল মোদি সরকার এনেছে, তার জনবিরোধী চরিত্র উদঘাটিত করে কৃষকরা তার বিরুদ্ধে একবছর ধরে দিল্লিতে ঘাঁটি গেড়ে গণতান্ত্রিক পথে লড়লেও সরকার তা পাল্টাতে নারাজ। সরকার ওই কৃষি আইন কৃষকদের উপর জোর করে চাপাতে বদ্ধপরিকর বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থে। এই অবস্থায় কৃষকরা বিজেপি থেকে মুখ না ফিরিয়ে পারে?

জনজীবনের সকল ক্ষেত্রেই সরকার তার জনবিরোধী নীতির দ্বারা আক্রমণ নামিয়ে আনছে। শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত মানুষ বিজেপি শাসনে ক্ষুব্ধ। নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে শিক্ষার গৈরিকিকরণ, ইতিহাস পাল্টানো, বেসরকারিকরণ, ব্যাপক ফি বৃদ্ধি, ক্যাপিটেশন ফি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। শিক্ষায় 'ব্লেন্ডেড মোড' অর্থাৎ অনলাইন ও অফলাইনের মিশ্র পদ্ধতির নামে বাস্তবে অনলাইন নির্ভরতা শিক্ষক নিয়োগকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলছে। সাম্প্রদায়িক বিভেদ, পরধর্ম বিদ্বেষ বেড়েই চলেছে সরকারের মদতে। দলিত জনগোষ্ঠীর উপর শাসক দলের মদতপুষ্ট জাতিবাদী আক্রমণ বাড়ছে। ফলে বিজেপি শাসনে সাধারণ মানুষের 'আচ্ছে দিন' একেবারেই অধরা। পোয়া বারো পুঁজিপতি শ্রেণির।

এই অবস্থায় বিজেপি নেতারা দলের সমর্থন ফিরিয়ে আনার জন্য যতই দলীয় কর্মীদের মাঠে নামাক, তাদের শাসনে মানুষের দুরবস্থা বাড়তেই থাকবে এবং মানুষ পরিবর্তন চাইবেই। বার বার মানুষের বিক্ষোভ ফেটে পড়বেই। পড়ছেও। দরকার এই পরিবর্তনের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যোগ্য সংগ্রামী বামপন্থী নেতৃত্ব। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ এবং বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ, দুটোই ভারতের পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার রাজনৈতিক জোট। এই জোটের কোনওটিরই দ্বারা জনগণের স্বার্থ রক্ষা হতে পারে না। পুঁজিপতিদের সেবা করতে গিয়ে জনবিরোধী কাজের জন্য একটি জোট জনগণের ক্ষোভের সামনে পড়লে পুঁজিপতিরা তখন মানুষকে শান্ত করতে অপর জোটকে সামনে আনে। আবার এই জোটের জনবিরোধী কাজের জন্য মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে পুঁজিপতিরা তখন একে সরিয়ে আগের জোটকে আনে। জনগণের বিক্ষোভকে প্রশমিত করতে পুঁজিপতিদের এটা একটা মারাত্মক কৌশল। মারাত্মক কেন? কারণ, এর প্রতারণার ক্ষমতা অনেক বেশি। এর বাইরের রূপটা গণতান্ত্রিক। মানুষ মনে করে, সে ভোট দিয়ে নিজের সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। পুঁজিপতিদের মিডিয়ার প্রচারে প্রভাবিত হয়ে মানুষ ভোট দিয়ে যাকে প্রতিষ্ঠা করেছে সে পুঁজিপতিদের পছন্দের সরকার। রাজনৈতিক বিষয়ে চর্চার অভাবে মানুষ প্রথমে তা বুঝতে পারে না। পারে অভিজ্ঞতায়, একের পর এক জনবিরোধী নীতি দেখে, আর ক্ষোভের সাথে বলে কেউ কিছু করবে না। এই ক্ষোভ বা আক্ষেপের পিছনে রয়েছে জনগণের প্রকৃত বন্ধুশক্তিকে চিনতে না পারা।

বুর্জোয়াদের বিপরীতে কারা জনগণের প্রকৃত বন্ধু? অবশ্যই বামপন্থীরা। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ভারতের অধিকাংশ বামপন্থী দল কিছু সিটের আশায় বুর্জোয়া জোটে সামিল। বামপন্থীদের যে বিকল্প জোট গড়ে উঠেছিল সেই জোটের বেশিরভাগ শরিকই কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ-র সাথে তালমিল করে চলছে। এই অবস্থায় বিকল্প বামপন্থী ঝান্ডা তুলে ধরে এস ইউ সি আই (সি) জনগণকে সাথে নিয়ে সাধ্যমতো গণআন্দোলন গড়ে তুলছে। যেখানে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন গড়ে তুলছে সেখানেই এস ইউ সি আই (সি) সামিল হয়ে আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। এই শক্তি ছাড়া সমাজে যথার্থ পরিবর্তন আনার বাস্তবে আর কেউ নেই। আর কেউ নেই বুর্জোয়াদের ছলচাতুরির মুখোশ খুলে দিয়ে জনগণকে সচেতন করার।

“ দরকার এই পরিবর্তনের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যোগ্য সংগ্রামী বামপন্থী নেতৃত্ব। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ এবং বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ, দুটোই ভারতের পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার রাজনৈতিক জোট। এই জোটের কোনওটিরই দ্বারা জনগণের স্বার্থ রক্ষা হতে পারে না।

এআইডিওয়াইও-র তৃতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলন ডিসেম্বরে

যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও-র তৃতীয় সর্বভারতীয় যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ১১-১২ ডিসেম্বর, ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলায়। দেশজুড়ে ভয়াবহ বেকারত্ব, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, রেল ব্যাঙ্ক বিমা সহ সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলির বেসরকারিকরণের ফলে দেশের মানুষ, বিশেষত যুব সমাজ আজ ভয়ঙ্কর সংকটের সম্মুখীন। দেশজুড়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থবাহী নীতি অনুসরণের ফলেই এই সঙ্কট তৈরি হয়েছে। নিজেরা রেহাই পেতে পুঁজিপতি শ্রেণি সঙ্কটের সমস্ত বোঝা এমনিতেই সঙ্কটের ভারে নুয়ে পড়া সাধারণ মানুষের উপর মূল্যবৃদ্ধি, করবৃদ্ধি, ছাঁটাইয়ের আকারে চাপিয়ে দিচ্ছে। সরকারি ক্ষেত্রে নতুন নিয়োগ প্রায় বন্ধই করে দিয়েছে। শুধু অর্থনৈতিক আক্রমণ নয়, রুচি, সংস্কৃতি, নৈতিকতা, মূল্যবোধের উপরও চূড়ান্ত আঘাত হানছে। অপসংস্কৃতির জোয়ার, বিভেদ বিদ্বেষের রাজনীতি, মদ, মাদক দ্রব্য, জুয়া খেলার প্রলোভনে মাতিয়ে রাখার অপচেষ্টা চলছে সর্বাত্মক। পরিণামে মহিলাদের উপর অত্যাচারের মাত্রাও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার গুলো এহেন পুঁজিবাদের সেবাদাসের ভূমিকা পালন করছে।

এ সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে দেশজুড়ে যুবকেরা এ আই ডি ওয়াই ও-র পতাকাতলে সমবেত হয়ে, সর্বাত্মক আন্দোলন পরিচালনার চেষ্টা করছে। প্রাইভেট টিউটর, নার্স, ডেলিভারি বয়, বাইক ট্যাক্সি চালক থেকে শুরু করে নানা স্তরের কর্মপ্রার্থী যুবকেরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করছেন। দেশজুড়ে সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে এ আই ডি ওয়াই ও-র উদ্যোগে গড়ে ওঠা 'আনএমপ্লয়েড ইউথ স্ট্রাগল কমিটি'। মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, মহারাষ্ট্র সহ অন্যান্য রাজ্যে আন্দোলন বৃহত্তর রূপ নিতে শুরু করেছে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, নানা আক্রমণ, অত্যাচারকে উপেক্ষা করে, এ যুগের মহান দার্শনিক চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শ ও উন্নত নীতি নৈতিকতার আধারে এই আন্দোলনকে সর্বাত্মক রূপ দিতেই এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখবেন এস ইউ সি আই (সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ সিং এবং সমাপ্তি ভাষণ রাখবেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ।

সুরক্ষা ছাড়াই ম্যানহোলে কাজ করানো অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে

ম্যানহোলে মানুষ নামিয়ে কাজ করানোর প্রতিবাদ করে এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১২ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, গতকাল সল্টলেকে কোনও রকম সুরক্ষা ছাড়াই যেভাবে কর্মীদের ম্যানহোলে নামিয়ে সারাদিন কাজ করানো হয়েছে তাতে পরিষ্কার গরিব শ্রমজীবী মানুষদের প্রতি রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কত অমানবিক। গত ফেব্রুয়ারিতে কুঁদঘাটে এইভাবে অসুরক্ষিত অবস্থায় ম্যানহোলে নামার ফলে চার জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। তখন কলকাতা পৌরসভা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ভবিষ্যতে আর এমন হবে না। এবার সল্টলেক পৌরসভার চেয়ারপার্সনও নানা ভাষায় সাফাই দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যখন ম্যানহোলে মানুষ নামানো নিষিদ্ধ এবং নামালেও উপযুক্ত সুরক্ষার বর্ম দিয়ে নামানোর কথা তখন সরকার ও পৌর কর্তৃপক্ষের এই অপরাধমূলক গাফিলতি কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি এবং অবিলম্বে এই মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা বন্ধের দাবি করছি।

নকশালবাড়িতে আশাকর্মীদের আন্দোলন

নকশালবাড়ি ঃ ৯ নভেম্বর নকশালবাড়ি বিএমওএইচ-এর কাছে ৭ দফা দাবিতে আশা কর্মীরা ডেপুটেশন দেন ও বিক্ষোভ দেখান। বক্তব্য রাখেন দার্জিলিং জেলা ইনচার্জ নমিতা চক্রবর্তী। এ ছাড়া নেতৃত্ব দেন ব্লক সম্পাদক ফাল্গুনী বর্মন, বনানী সাহা, মমতা সাহা, স্মিতা আগরওয়াল, কৌশল্যা পাখরিন, ছায়া রানি রিজল, কুষদলা লোহার।

উলুবেড়িয়া ঃ হাওড়া গ্রামীণ জেলার বিভিন্ন ব্লকের নেতৃত্বকারী আশাকর্মীদের নিয়ে উলুবেড়িয়া বাজারপাড়ায় ৯ নভেম্বর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি শ্রমিক সংগঠন অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন। বকেয়া ভাতা মেটানো, আক্রান্তদের প্রাপ্য টাকা মেটানো প্রভৃতি দাবিতে আন্দোলন জোরদার করতে নভেম্বর মাসে ফরম্যাট জমা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সমস্যার সমাধান না হলে প্রয়োজনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবেন বলে আশা কর্মীরা শপথ নেন।

নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে বুক স্টল

৭ থেকে ১৭ নভেম্বর রাশিয়ায় মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়। বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের কাছে এই দশ দিন অত্যন্ত প্রেরণার। ১০৪তম নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে নভেম্বর মাস জুড়ে সারা দেশের সঙ্গে এ রাজ্যেও সর্বত্র এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে বুকস্টল হয়। নভেম্বর বিপ্লব ও তার আলোকে এ দেশের বিপ্লবী চিন্তা সংবলিত নানা বই ও বর্তমান সময়ের বিভিন্ন আন্দোলন নিয়ে রচিত বই এবং মনীষীদের জীবন ও সংগ্রাম সংক্রান্ত বই দিয়ে স্টলগুলি সাজানো হয়। মহান মার্কসবাদী নেতৃত্বের ছবি সহ উদ্ধৃতি স্টলগুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলে। ছবি ঃ কলকাতার কলেজ স্ট্রিট

মেছেদায় নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের কনভেনশন

প্যাসেঞ্জার ট্রেনকে এক্সপ্রেস করে বাড়ানো ভাড়া রদ, যাত্রীদের প্রয়োজন অনুযায়ী ট্রেনের সময়সূচি নির্ধারণ, রেলের বেসরকারিকরণ রোধ সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে ১৪ নভেম্বর মেছেদা বিদ্যাসাগর হলে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে শাখার নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। মূল বক্তা ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ, নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের পশ্চিমবঙ্গ শাখার আহ্বায়ক ডাক্তার তরুণ মণ্ডল। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট নাগরিক অরূপ রতন সাহা, সুরঞ্জন মহাপাত্র, অনুপ সরকার, দেবদুলাল ঘোড়াই প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন মধুসূদন বেরা।

সভা থেকে মধুসূদন বেরাকে সভাপতি, সুরঞ্জন মহাপাত্র ও সরোজ মাইতিকে যুগ্ম সম্পাদক করে ৭০ জনের শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়। ডাঃ তরুণ মণ্ডল রেলের বেসরকারিকরণ সহ কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের সামগ্রিক আক্রমণের বিরুদ্ধে নাগরিকদের রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

টাটাকে এয়ার ইন্ডিয়া 'উপহার' বিজেপি সরকারের

মাত্র ১৮ হাজার কোটি টাকায় এয়ার ইন্ডিয়া বিক্রির চুক্তি হচ্ছে। তার মধ্যে টাটা সন্স (টাটা গোষ্ঠীর মূল সংস্থা) ১৫,৩০০ কোটি টাকার ঋণের বোঝা নেবে। ফলে সরকারের ঘরে নগদ আসছে মাত্র ২,৭০০ কোটি টাকা। বাস্তবে এই সামান্য অর্থের বিনিময়ে বিজেপি সরকার টাটার হাতে এয়ার ইন্ডিয়া উপহার হিসেবে তুলে দিল।

এই টাকার বিনিময়ে টাটারা কী পাবে? এয়ার ইন্ডিয়ার কাছে শুধু বিমানই আছে ৩২ হাজার কোটি টাকার। এর সাথে এয়ার ইন্ডিয়ার অন্যান্য প্রধান সম্পত্তিগুলি— মহার্ঘ ল্যান্ডিং ও পার্কিং স্লট, আন্তর্জাতিক উড়ানের অধিকার, উড়ানের জগতে 'এয়ার ইন্ডিয়া' ব্র্যান্ড ব্যবহারের সুযোগ, এর সব কিছুই টাটারা পাবে বিনামূল্যে।

এয়ার ইন্ডিয়া বিক্রির প্রধান সরকারি যুক্তি ছিল, এই সংস্থা একসময় লাভজনক থাকলেও, এখন ঋণের বোঝায় চলতে পারছে না। যদিও এয়ার ইন্ডিয়ারলোকসানের পিছনে প্রধানমন্ত্রী সহ ভিআইপিদের জন্য রাজকীয় পরিষেবা দেওয়া, সরকারের পেটোয়া আমলা ও রাজনীতিকদের পুরস্কার হিসাবে তাদের রাজকীয় সুবিধা দিয়ে সংস্থার মাথায় বসিয়ে রাখতে গিয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার তহবিল খালি হয়েছে। এছাড়া সবচেয়ে জনপ্রিয় রুটগুলি ক্রমাগত সস্তার বেসরকারি কোম্পানির হাতে দেওয়া হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়ার ভাড়া ক্রমাগত বাড়িয়ে তাকে অনাকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। এগুলো সবই পরিকল্পিত পদক্ষেপ, যাতে এই সংস্থা দুর্বল হয়। ভারত সরকার ১৯৪৮ সালে এয়ার ইন্ডিয়া অধিগ্রহণ করে এবং ১৯৫৩ সালে এটি জাতীয়করণ করা হয়। সেই সময় থেকে সরকার এই সংস্থাটি গড়ে তুলতে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা খরচ করেছে। শুধু ২০০৯-১০ সালেই এই কাজে সরকার ১ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেছিল। অথচ সেই সরকারি সম্পত্তি মাত্র ১৮ হাজার কোটি টাকায় বেচে দেওয়া হল। আরও অবাক করার মতো বিষয় হল, এয়ার ইন্ডিয়ার ৬৭ হাজার কোটি টাকা ঋণের ৪৬ হাজার ২৬২ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারই বহন করবে বলে ঘোষণা করেছে। এয়ার ইন্ডিয়া প্রাইভেট হয়ে গেল, কিন্তু তার ঋণ প্রাইভেট হল না। অথচ বেসরকারি হাতে বেচে দেওয়ার জন্য বিপুল ঋণকেই যুক্তি হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে। ঋণটাই যদি সরকার ঘাড়ে নেয়, তা হলে বেচে দেওয়ার যুক্তি কী? এই বিপুল পরিমাণ অর্থ আপনার-আমার ট্যাক্সের টাকাতেই পরিশোধ করা হবে। প্রয়োজনে জীবন-যন্ত্রণায় জর্জরিত জনসাধারণের ওপর করের বোঝা আরও বাড়ানো হবে। শুধু তাই নয়, এর ফলে সংস্থার হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর চাকরি অসুরক্ষিত হয়ে পড়বে এবং একই সাথে এঁদের পরিবারের সদস্যদেরও জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

সরকারি সংস্থা ও সরকারি ক্ষেত্রের সর্বাত্মক বেসরকারিকরণ বিজেপি পরিচালিত বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত নীতি। রেল, ব্যাঙ্ক, বিমা সহ সব রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বেচে দেওয়ার জন্যই সরকারের ন্যাশনাল মনিটাইজেশন পাইপলাইন প্রকল্প। এই প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবেই এয়ার ইন্ডিয়ার বেসরকারিকরণ। এভাবেই জনগণের অর্থে গড়ে ওঠা সম্পত্তি বৃহৎ কর্পোরেট মালিকদের হাতে সরকার তুলে দিচ্ছে। অর্থমন্ত্রী তাঁর এবারের বাজেটে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তি বেচার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছেন। এ ছাড়া নাকি সরকারের রাজকোষ ঘাটতি সামাল দেওয়া যাবে না!

কিন্তু জনগণকে সরকার কী দিয়েছে? জনগণের জন্য সুবিধা দিতে গিয়ে কি ঘাটতি হয়েছে? তা তো নয়, বরং সরকার জনগণের জন্য সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয় কমিয়েছে, বাড়িয়েছে পুঁজিপতিদের জন্য নানা সুবিধা। ফলে কোষাগার ঘাটতির কারণ পুঁজিপতিদের ভেট দেওয়ার জন্য জনগণের করের টাকা জলের মতো ঢেলে দেওয়া। জনগণকে শুষে নিয়ে নিংড়ে পিষে ছিবড়ে করে ফেলার অবাধ মৃগয়াক্ষেত্র হয়ে উঠছে ভারত। বিজেপি সরকারের মালিকতোষণকারী মানুষমারা জনবিরোধী এই নীতির বিরুদ্ধে সর্বস্তরের জনসাধারণের সোচ্চার হওয়া ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে এগিয়ে আসা ছাড়া আজ আর বিকল্প কোনও পথ নেই।

নৈহাটিতে ছাত্র-যুবদের বুকস্টল

নৈহাটির পাওয়ার হাউস মোড়ে এ আই ডি এস ও, এ আই ডি ওয়াই ও ব্যারাকপুর ইউনিটের উদ্যোগে ৪-৬ নভেম্বর বুকস্টল অনুষ্ঠিত হয়। স্টল উদ্বোধন করেন এ আই ডি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অনুরাধা ওঝা। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন এ আই ডি ওয়াই ও উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অভিজিৎ শঙ্খ বণিক। স্টলের পাশাপাশি এলাকার বাড়িতে বাড়িতে ছাত্র যুব কমরেডরা বই নিয়ে যান।

রাষ্ট্র ঃ শ্রেণি-বিরোধের অনিরসনীয়তার ফল

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন

রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ১০৪তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে মহান লেনিনের বিখ্যাত গ্রন্থ 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' থেকে একটি অংশ আমরা প্রকাশ করলাম। রচনাটি রাষ্ট্র সম্পর্কে সঠিক ধারণা গড়ে তুলতে সহায়তা করবে ভেবেই আমাদের এই প্রচেষ্টা।

বর্তমানে মার্কসের মতবাদের ক্ষেত্রে যা ঘটছে, মুক্তিসংগ্রামরত নিপীড়িত শ্রেণিগুলির অন্যান্য চিন্তানায়ক ও নেতাদের মতবাদের ক্ষেত্রেও ইতিহাসের গতিপথে প্রায়শ তা-ই ঘটেছে। মহান বিপ্লবীদের জীবদ্দশায় উৎপীড়ক শ্রেণিগুলি লাগাতার তাঁদের তাড়া করে বেড়ায়, তাঁদের শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ-দুষ্ট বৈরিতা ও হিংস্র ঘৃণা প্রকাশ করে এবং নির্বিচারে সে-সবের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও কুৎসার অভিযান চালায়। মৃত্যুর পরে এইসব বিপ্লবীকে নিরীহ দেব-বিগ্রহে পরিণত করার, সাধু সিদ্ধপুরুষ রূপে গণ্য করার চেষ্টা হয়ে থাকে। নিপীড়িত শ্রেণিগুলির 'সান্ত্বনা'র জন্য এবং তাদের প্রতারণার উদ্দেশ্যে এই সব বিপ্লবীর নামের সঙ্গে একটা জৌলুস জুড়ে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে তাঁদের বৈপ্লবিক মতবাদের মর্মবস্তুকে ছেঁটে দিয়ে তাকে নিবীর্য খেলো করা হয়, তার বৈপ্লবিক তীক্ষ্ণতাকে ভোঁতা করে দেওয়া হয়। বর্তমান সময়ে বুর্জোয়ারা এবং শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যেকার সুবিধাবাদীরা মার্ক সবাদ 'সংশোধনে'র কাজে পরস্পর সহযোগিতা করে চলেছে। তারা মার্কসীয় শিক্ষার বৈপ্লবিকমর্মকেই বর্জন করে, ধোঁয়াটে করে তোলে ও বিকৃত করে। বুর্জোয়া শ্রেণির কাছে যে অংশটুকু গ্রহণযোগ্য হতে পারে বলে মনে হয়, ততটুকুই মাত্র এরা সামনে নিয়ে আসে ও জোর গলায় তার প্রশংসা করে। সব উগ্র জাতীয়তাবাদীই আজকাল 'মার্কসবাদী' (হাসবেন না)। জার্মানির বুর্জোয়া পণ্ডিতরা, যাঁরা মাত্র গতকালও মার্কসবাদ খতমের কাজে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, তাঁরাই আজ 'জাতীয়-জার্মান' মার্কসের কথা ঘন ঘন বলছেন। আর, যে মজুর-ইউনিয়নগুলিকে পররাজ্যগ্রাসী যুদ্ধের পক্ষে এমন চমৎকার সংগঠিত দেখা যাচ্ছে, তাঁদের মতে, মার্কসই নাকি সেই মজুর-ইউনিয়নগুলিকে শিক্ষিত করে তুলেছেন!

এরকম অবস্থায় যখন ব্যাপকভাবে মার্কসবাদের বিকৃতি ঘটানো হচ্ছে, তখন রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসের প্রকৃত শিক্ষা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই আমাদের প্রধান কর্তব্য। এই জন্য মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনা থেকে বহু দীর্ঘ উদ্ধৃতির প্রয়োজন হবে। অবশ্য দীর্ঘ উদ্ধৃতির ফলে গ্রন্থ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে এবং সবার পক্ষে সহজপাঠ্য হবে না। কিন্তু তবুও দীর্ঘ উদ্ধৃতি বাদ দেওয়াও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভাবকদের সমগ্র মতামত ও সেই মতামতের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে পাঠক যাতে স্বাধীনভাবে একটা ধারণা গঠন করতে পারেন এবং বর্তমানে কাউটস্কিপন্থীদের হাতে সেই-সব মতামতের যে বিকৃতি ঘটে চলেছে মার্কস-এঙ্গেলসের লেখা থেকেই তা যাতে সর্বসমক্ষে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, সেই জন্য তাঁদের রচনায় রাষ্ট্রের কথা যেখানে আছে সেই সমস্ত অংশই, অন্তত সবচেয়ে অপরিহার্য অংশগুলি যথাসম্ভব পুরাপুরি অবশ্যই উদ্ধৃত করতে হবে।

নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকীতে স্ট্যালিনের ছবি নিয়ে মিছিল। মস্কো

'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' নামক এঙ্গেলসের সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ নিয়েই শুরু করা যাক। ১৮৯৪ সালে স্টুটগার্টে এই গ্রন্থের ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মূল জার্মান গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত অংশ আমাদের অনুবাদ করে নিতে হবে। কারণ, রুশ ভাষায় এই গ্রন্থের অনেক অনুবাদ থাকলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেসব অনুবাদ অসম্পূর্ণ, অথবা আদৌ সন্তোষজনক নয়।

এঙ্গেলস তাঁর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মূল কথা বলতে গিয়ে বলেছেন ঃ "...রাষ্ট্র কোনও ক্রমেই বাইরে থেকে সমাজের উপর আরোপিত একটি শক্তি নয়। হেগেল বলতেন, 'রাষ্ট্র নৈতিক বোধের বাস্তব রূপ', রাষ্ট্র 'যুক্তির প্রতিমূর্তি ও বাস্তব রূপ'; কিন্তু রাষ্ট্র তেমন কিছু নয়, বরং সমাজের বিকাশের বিশেষ একটি স্তরেই রাষ্ট্রের উদ্ভব। সমাজে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে মানেই সমাজ সমাধানের অতীত একটা স্ববিরোধিতার জালে জড়িয়ে পড়েছে। এর অর্থ, মীমাংসার অতীত এক দ্বন্দ্বে সমাজ দীর্ণ, যে দ্বন্দ্ব মীমাংসায় সমাজ অক্ষম। বিভিন্ন শ্রেণি, যাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ পরস্পরবিরোধী, তারাই হচ্ছে সমাজের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বরত শ্রেণিগুলি যাতে নিষ্ফল সংগ্রামে নিজেদের ও গোটা সমাজকেই ধ্বংস করে ফেলতে না পারে, তারই জন্য এমন একটি শক্তির প্রয়োজন ঘটে যাকে আপাতদৃষ্টিতে সমাজের ঊর্ধ্বে অবস্থিত বলে মনে হয়— শ্রেণি-সংঘাত প্রশমিত করে 'শৃঙ্খলা'র গণ্ডির মধ্যে তাকে সীমাবদ্ধ করে রাখাই হল যার উদ্দেশ্য। এই শক্তি, যা সমাজ থেকে উদ্ভূত হয়েও নিজেকে সমাজের ঊর্ধ্বে স্থাপন করে এবং ক্রমাগত সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়, তা হচ্ছে রাষ্ট্র।" (পৃষ্ঠা ১৭৭-৭৮ ষষ্ঠ জার্মান সংস্করণ)।

১৩ নভেম্বর বালুরঘাটে মিছিল

রাষ্ট্রের অর্থ ও ঐতিহাসিক ভূমিকা কী, সে সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্বের মূল ধারণা উদ্ধৃত অংশের মধ্যে স্পষ্ট ও যথাযথভাবে প্রকাশ পেয়েছে। রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণিবিরোধের অনিরসনীয়তার ফল ও অভিব্যক্তি। যখন যেখানে ও যে অনুপাতে শ্রেণি বিরোধ বাস্তবে সমাধান করতে পারা যায় না, তখন সেই অবস্থায় সেই অনুপাতে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। অপর দিক থেকে এটাও বলা চলে, রাষ্ট্রের অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে, শ্রেণিবিরোধ মীমাংসার অতীত।

ঠিক এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মূল বিষয়টির ব্যাপারেই মার্কসবাদকে বিকৃত করা হয়। বিকৃত করা হয় প্রধানত দুই দিক থেকে।

একদিকে, বুর্জোয়া তাত্ত্বিক এবং বিশেষ করে পেটি-বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা— যেখানে শ্রেণি-বিরোধ ও শ্রেণি-সংগ্রাম আছে কেবল সেখানেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিদ্যমান— অবিসংবাদিত ও ঐতিহাসিক তথ্যের চাপে এটা স্বীকার করতে বাধ্য হলেও, তারা মার্কসকে এমনভাবে 'সংশোধন' করে যাতে মনে হবে যে রাষ্ট্র হল বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে আপস-মীমাংসা ঘটাবার একটা যন্ত্র বিশেষ। মার্কসের মতে, বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে আপস-মীমাংসা যদি সম্ভবই হত, তা হলে রাষ্ট্রের উদ্ভবই হত না, রাষ্ট্র স্বকীয় অস্তিত্বই বজায় রাখতে পারত না। কিন্তু পেটি-বুর্জোয়া এবং সঙ্কীর্ণমনা অধ্যাপক ও প্রচারকদের মতে, রাষ্ট্রশক্তি বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে আপস-নিষ্পত্তি ঘটায়— তাঁরা মাঝে মাঝেই উদারমনা সেজে মার্কসের উক্তির দোহাই পেড়ে তাঁদের এই মত জাহির করেন। মার্কসের মতে, রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণি-শাসনের যন্ত্র, এক শ্রেণি কর্তৃক অপর শ্রেণিকে পীড়ন করবার যন্ত্র। এ হল 'শৃঙ্খলা'র ফল যা শ্রেণিবিরোধকে সীমার মধ্যে রেখে এই পীড়নকে আইনসঙ্গত করে ও স্থায়িত্ব দেয়। কিন্তু পেটি-বুর্জোয়া রাজনীতিকদের মতে শৃঙ্খলার অর্থ, বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে আপস-নিষ্পত্তি, এক শ্রেণি কর্তৃক অপর শ্রেণিকে পীড়ন করা নয়। তাদের মতে, শ্রেণি-সংঘর্ষ প্রশমিত করার অর্থ, শ্রেণিগুলির মধ্যে সমন্বয় ঘটানো, উৎপীড়কদের উৎখাত করার সংগ্রামের নির্দিষ্ট উপায় ও পদ্ধতি থেকে নিপীড়িত শ্রেণিগুলিকে বঞ্চিত করা নয়।

উদাহরণ স্বরূপ, ১৯১৭ সালের বিপ্লবে যখন রাষ্ট্রের তাৎপর্য ও ভূমিকার প্রশ্নটি একটি বাস্তব প্রশ্ন হিসাবে পূর্ণ গুরুত্ব নিয়ে দেখা দিল এবং ব্যাপক ভিত্তিতে সেই প্রশ্নের আশু মীমাংসার প্রয়োজনও দেখা দিল, তখন সঙ্গে সঙ্গেই, সোসালিস্ট-রেভোলিউশনারিরা ও মেনশেভিকরা সকলেই সেই পেটি-বুর্জোয়া তত্ত্বে নেমে এল যে, 'রাষ্ট্র' শ্রেণিগুলির মধ্যে 'সমন্বয়' ঘটায়। এই দুই দলের রাজনীতিকদের অসংখ্য প্রস্তাব ও নিবন্ধ এই পেটি-বুর্জোয়া এবং সঙ্কীর্ণমনা 'সমন্বয়'-এর তত্ত্বে ঠাসা। রাষ্ট্র যে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির শাসন-যন্ত্র, যার সঙ্গে তার প্রতিপক্ষের (তার বিরুদ্ধ শ্রেণির) সমন্বয় ঘটানো সম্ভব নয়— এ বিষয়টি পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা কখনই বুঝতে পারবে না। আমাদের সোসালিস্ট-রেভোলিউশনারি ও মেনশেভিকরা যে আদপেই সোসালিস্ট নয় (আমরা, বলশেভিকরা যে কথা সবসময় বলে এসেছি), সমাজতন্ত্র-ঘেঁষা বুলি-আওড়ানো পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী মাত্র, তার অন্যতম জাজ্বল্যমান উদাহরণ হচ্ছে রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাদের এই ধারণা।

অন্য দিকে 'কাউটস্কিপন্থীরা' যেভাবে মার্কসকে বিকৃত করে, তা আরও সূক্ষ্ম ধরনের। 'তত্ত্বের দিক থেকে' তারা এ কথা অস্বীকার করে না যে, রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণি-শাসনের যন্ত্র এবং বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ আপসে মীমাংসা করা যায় না। কিন্তু যে বিষয়টি তারা উপেক্ষা করে বা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করে, তা হল এই— মীমাংসার অতীত যে শ্রেণি-বিরোধ, তারই ফলে যদি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়ে থাকে, রাষ্ট্র যদি সমাজের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এক শক্তি হয় যে শক্তি 'সমাজ থেকে নিজেকে ক্রমশই বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছে', তা হলে স্পষ্টতই বোঝা যায়, একটা সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া নিপীড়িত শ্রেণির মুক্তিলাভ সম্ভব নয়।

লেনিন সরণিতে এআইইউটিইউসি-র কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে নভেম্বর বিপ্লব উপলক্ষে সভা। ১৩ নভেম্বর

শুধু তাই নয়— শাসক শ্রেণি রাষ্ট্রশক্তির যে যন্ত্র তৈরি করেছে এবং যার মধ্যে এই 'সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা' মূর্ত রূপ নিয়েছে, সেই রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংস ছাড়াও নিপীড়িত শ্রেণির মুক্তি সম্ভব নয়। আমরা পরে দেখব, বিপ্লবের করণীয় কাজের সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের গুরুত্ব সম্পর্কে মার্কস দ্ব্যর্থহীনভাবে এই তত্ত্বগত স্বতঃপ্রমাণিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। এবং এর পরে আমরা বিস্তারিত ভাবে দেখাব যে, কাউটস্কি ঠিক এই সিদ্ধান্তটিই 'ভুলে গেছেন' এবং বিকৃত করেছেন।

পাঠকের মতামত

অনলাইন গেম এক মারাত্মক আসক্তি

প্রায় দু'বছর ধরে স্কুল ও কলেজ বন্ধ থাকার কারণে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা শিকেয় উঠেছে। অনলাইনে পড়াশুনা অল্প কিছু সংখ্যকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অনলাইনে ক্লাস করার জন্য স্মার্টফোন খুবই জরুরি। বাবা মায়েরা তাদের সন্তানদের জন্য ঘটি-বাটি বিক্রি করে বা গয়না বন্ধক দিয়েও ফোন কিনে দিতে বাধ্য হন। দেখা যায়, কিছু দিন যেতে না যেতেই তাদের আদরের সন্তান অনলাইন গেমে আসক্ত হয়ে পড়েছে। 'পাবজি' ও 'ফ্রি ফায়ার'— মূলত এই দুটি গেমেই তারা সব সময় বুঁদ হয়ে থাকে। ডাকলে সাড়া পাওয়া যায় না, স্নান-খাওয়া ভুলে যায়, বিপদ-আপদে, সুখ-দুঃখে, এমনকি শোকের সময়ে, অন্যের অসুস্থতার সময়েও এই খেলা ছাড়তে পারে না তারা। ফোন কেড়ে নিলে বা লুকিয়ে রেখে দিলে, অথবা ফোনে টাকা না ভরে দিলে ছেলেমেয়েদের তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়।

কিন্তু এর জন্য কি শুধু এই ছেলেমেয়েরাই দায়ী? সরকারি নেতা-মন্ত্রীদের কি এ সব অজানা? নাকি তাঁরা চান আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাক! তারা আকৃতিতে মানুষ, চরিত্রে অমানুষ হয়ে থাক! এতে বোধহয় তাদের অবাধে শোষণ চালাতে সুবিধা হবে। ফোন কোম্পানিগুলি টাকার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে থেকেই নেট বন্ধ করে দেয়, টাকা ভরার জন্য ফোন করতে থাকে, মেসেজ করে বারবার। টাকা ভরলেও সঙ্গে সঙ্গে নেট দেয় না। কোথাও অভিযোগ জানানোর উপায় নেই। এ ব্যাপারে সব কোম্পানিই সমান। তারা শুধু বোঝে মুনাফা। ছোট ছাত্রছাত্রীরাও আজ ওদের হাতে ক্রীড়নক। সমস্যাটা তীব্র রূপ নিচ্ছে স্কুল বন্ধ থাকায়।

বিদ্যুৎ সীট
জগদল্লা, বাঁকুড়া

পরিচারিকাদের প্রীতি সম্মিলন তমলুকে

১৪ নভেম্বর সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির তমলুক শাখার উদ্যোগে পূর্ব মেদিনীপুরের রাজাবাজারে প্রীতি সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের ৫০ জন সদস্য। রান্না করা, বাসন মাজা, ঘর মোছার মতো নিত্যদিনের একঘেয়েমির ফাঁকে একটু আনন্দ, সবাই একসঙ্গে গান, আবৃত্তি, কথাবার্তার মাধ্যমে দিনটিকে উপভোগ করলেন পরিচারিকারা। সপ্তাহে একদিন ছুটি দিতে হবে, মজুরি নির্দিষ্ট করতে হবে, শ্রমিকের পরিচয়পত্র দিতে হবে ইত্যাদি দাবিতে আন্দোলন আরও জোরদার করার পাশাপাশি মনীষীচর্চাতেও গুরুত্ব দেবেন বলে এদিন জানালেন তাঁরা। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী জীবন দাস, সমিতির অফিস সম্পাদক অঞ্জলি মান্না, জেলা কমিটির সদস্য অসীমা পাহাড়ি, শীলা দাস।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনিবার্য ফল ভয়াবহ বেকারত্ব

রাজ্যে রাজ্যে করোনা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ কমার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতির পালে বাতাস লাগতে শুরু করেছে বলে দাবি করছেন মন্ত্রী ও আধিকারিকেরা। কিন্তু কর্মসংস্থানের ছবিতে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। নতুন কাজ সৃষ্টি হওয়া দূরস্থান, কর্মরতরাও কাজ হারিয়ে চলেছেন। স্নাতক, স্নাতকোত্তর, পিএইচডি, এমবিএ, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি হাসিল করেও চাকরি মিলছে না। পিওন, সুইপারের কাজ, যেখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশেষ দরকার পড়ে না, তা পাওয়ার জন্যও উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে চলছে অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা। ভোটের আগে নেতা-মন্ত্রীরা চাকরির ঢালাও প্রতিশ্রুতি দিলেও ভোট মিটে গেলেই সেসব অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। চাকরির দাবিতে বেকার যুবকরা বিক্ষোভ দেখালে চালানো হচ্ছে পুলিশি নির্যাতন। রোজগারের পথ দেখাতে নেতা-মন্ত্রীরা পকোড়া ভাজা, তেলেভাজার দোকান খোলার পরামর্শ দিচ্ছেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশনেতারা বলেছিলেন— সব হাতে কাজ দেওয়া হবে। এর পর থেকে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ভোটের ঠিক আগে নতুন চাকরির দেদার প্রতিশ্রুতি আমরা শুনে চলেছি। কেন্দ্রে সরকারে বসার আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বছরে ২ কোটি বেকারের কাজ হবে বলে গলা ফাটিয়েছিলেন। অথচ দেখা যাচ্ছে, নতুন চাকরি সৃষ্টি তো দূর, সরকারি দপ্তরগুলিতে কর্মচারীর সংখ্যা ক্রমাগত কমছে। যেটুকু নিয়োগ হচ্ছে, তার বেশির ভাগটাই ঠিকা হিসাবে যেখানে শ্রমিক-কর্মচারীরা প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সরকারি চাকরির বেহাল দশা নিচের সারণীটি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় ঃ

সরকারি কর্মচারীর সংখ্যা

সাল	মোট কর্মচারী (লক্ষে)
২০০৯-১০	১৪.৯০
২০১০-১১	১৪.৪০
২০১২-১৩	১৪.০২
২০১৩-১৪	১৩.৪৯
২০১৪-১৫	১২.৯১
২০১৫-১৬	১১.৮৫
২০০৬-১৭	১১.৩৫
২০১৭-১৮	১০.৮৮
২০১৮-১৯	১০.৩৩

এ দিকে দেশে স্বাভাবিক নিয়মেই কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। ২০১৫ সালের মে মাসে সারাদেশে কর্মক্ষম মানুষ ছিল ৯৪.৫৮ কোটি। ২০২১-এর ফেব্রুয়ারিতে ১১.২২ কোটি বেড়ে তা দাঁড়িয়েছে ১০৫.৮ কোটিতে। অথচ কমছে কর্মরত মানুষের সংখ্যা। ২০১৫ সালে কাজে যুক্ত ছিলেন কর্মক্ষম মানুষের প্রায় ৪৯ শতাংশ। ২০২১-এ দেখা যাচ্ছে কর্মরত মানুষের সংখ্যা মোট কাজ করতে সক্ষম মানুষের মাত্র ৪০ শতাংশের মতো। নরেন্দ্র মোদির গত সাত বছরের শাসনে সরকারি সংস্থায় কাজ চলে গেছে ৬ লক্ষ, ব্যাঙ্কে ৪.৫ লক্ষ মানুষের। অসংগঠিত ক্ষেত্রের অবস্থা তো না বলাই ভাল! ১২.৫ কোটি পরিযায়ী শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। বড় শিল্পে কর্মরত অসংগঠিত শ্রমিকদের ৬৭ শতাংশের কাজ চলে গেছে। এদিকে কেন্দ্রের বিভিন্ন দপ্তরে ৮০ লক্ষ পদ শূন্য পড়ে রয়েছে, সরকার নিয়োগ করছে না। ২০১৫-'২১ এই ৭ বছরে মনরেগা প্রকল্পে নাম লিখিয়েছেন ২৫ কোটি মানুষ, কিন্তু বছরে কাজ জুটেছে মাত্র ১ কোটি ৫২ লক্ষের। গত সাত বছরে সরকারি চাকরি পাওয়ার স্বপ্ন দেখে ইউপিএসসি-তে আবেদন করেছেন ৮.৫ কোটি যুবক-যুবতী। চাকরি পেয়েছেন মাত্র ২৫৬২৭ জন। স্টাফ সিলেকশন কমিশনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাত বছরে চাকরির আবেদন জমা পড়েছে ১২ কোটি বেকারের। কাজ মিলেছে মাত্র ২ লক্ষ ১৪ হাজার ৬০১ জনের। ২০১৪ পর থেকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মোট ৬ কোটি ৮৯ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতী এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে নাম নথিভুক্ত করলেও কাজ পেয়েছেন মাত্র ২৭ লক্ষ।

ফলে, পরিস্থিতি ভয়াবহ। সরকার এর দায় কোভিড পরিস্থিতির ওপর চাপাতে চাইলেও বাস্তবে মহামারি শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই বেকার সমস্যা ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়েছিল। বিক্ষোভের ভয়ে আতঙ্কিত মোদি সরকার এ সংক্রান্ত পরিসংখ্যানই প্রকাশ করতে দেয়নি।

শুধু ভারতে নয়, দুনিয়া জুড়েই আজ বেকারত্বের হাহাকার ক্রমে জোরালো হচ্ছে। সর্বোচ্চ মুনাফার লক্ষ্যে পরিচালিত বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যে ভয়াবহ বাজারসঙ্কটে ভুগছে, তা থেকে রেহাই পাওয়ার কোনওরকম উপায়ই খুঁজে বের করতে পারছেন না বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা। লাভের পিছনে ছুটে ক্রমাগত যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা বেছে নিচ্ছে পুঁজিপতিরা। নামমাত্র শ্রমিক দিয়ে উৎপাদনের কাজ চলছে। মুনাফা বাড়াতে চলছে ব্যাপক শ্রমিক ছাঁটাই। ফলে বিপুল হারে উৎপাদন হলেও উৎপাদিত পণ্য কেনার পয়সা থাকছে না কর্মহীন সাধারণ মানুষের হাতে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণেই সমাধান-অযোগ্য এই সমস্যার মুখোমুখি আজ বিশ্বের পুঁজিপতি শ্রেণি। কখনও আঞ্চলিক যুদ্ধ বাধিয়ে সামরিক খাতে ব্যয় বাড়িয়ে, কোথাও নানা জনমুখী প্রকল্প চালু করে জনগণের হাতে কিছু পয়সা জুগিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে সরকারগুলি। ঠিক সেই কারণেই নরেন্দ্র মোদির কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম দিকে মনরেগা প্রকল্পটির বাজেট-বরাদ্দে ব্যাপক কাটছাঁট করলেও শেষ পর্যন্ত আবার তাতেই গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়েছে যাতে সাধারণ মানুষ একশো দিনের কাজের মারফত কিছু রোজগারের মুখ দেখতে পারে।

কিন্তু এই পথে ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কাজ না পাওয়া ও কাজ হারানো মানুষের ক্ষোভ ক্রমাগত বাড়ছে। রাজ্যে রাজ্যে কাজের দাবিতে মাঝেমাঝেই বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে যুবসমাজ। কয়েক মাস আগে সামাজিক মাধ্যমে 'মোদি রোজগার দো' প্রচার দিনের পর দিন ট্রেন্ড করেছে। এই বিষয়ে শুধুমাত্র টুইটারে কুড়ি লক্ষ শেয়ার হয়েছিল। এই বিক্ষোভ ক্রমাগত আরও তীব্র হবে। এই অবস্থায় রোজগারের দাবিতে, ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। তার জন্য চাই সঠিক নেতৃত্বে সংগঠিত লাগাতার শক্তিশালী আন্দোলনের ঢেউ। এই আন্দোলনগুলিই ক্রমে সংহত হয়ে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবে রূপ নেবে, উচ্ছেদ করবে এই শোষণমূলক ব্যবস্থাটিকে। এ না হলে বেকার সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়।

পরিসংখ্যান বলছে, কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যায় ভারত আগামী তিরিশ বছর বিশ্বে শীর্ষস্থানে থাকবে। ফলে প্রয়োজন পড়বে অসংখ্য কর্মসংস্থানের। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এই বিপুল সংখ্যক মানুষের কাজের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। এ কাজ একমাত্র সম্ভব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিকল্পিত অর্থনীতি চালু হলে। মানুষ সেখানে সম্পদ হিসাবে গণ্য হয়। ব্যক্তি-পুঁজিপতির মুনাফার লক্ষ্যে নয়, দেশের সমস্ত মানুষের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত সেই উৎপাদন ব্যবস্থায় কাজ পায় প্রতিটি কর্মক্ষম হাত। রোজগেরে নাগরিকরা সৃষ্টি করে বিপুল চাহিদা। গড়ে ওঠে বাজার। প্রয়োজন মেটাতে বাড়তে থাকে উৎপাদন। কর্মসংস্থান হয় আরও বেশি সংখ্যায় মানুষের। এই পথে ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ফলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে কখনই মন্দার কবলে পড়তে হয় না। তাই সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার মানুষ বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত। সেই সভ্যতা গড়ে তোলার লক্ষ্যেই কোমর বাঁধতে হবে এ দেশের যুবসমাজকে।

আট দফা দাবিতে হিঙ্গলগঞ্জে বিক্ষোভ

সুন্দরবন নদীবাঁধ ও জীবন-জীবিকা রক্ষা কমিটির উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শাখার ডাকে হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকে ৯ নভেম্বর কংক্রিট নদীবাঁধ নির্মাণ করা, ম্যানগ্রোভ লাগানো ও সংরক্ষণ করা, নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা, জলনিকাশি ব্যবস্থা, সুন্দরবনের মানুষের জীবন-জীবিকার সরকারি ব্যবস্থা ও গবাদি পশু বাঁচাতে সরকারি খাদ্য সরবরাহ প্রভৃতি দাবিতে বিডিও দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

এক বছরে অপুষ্ট শিশুর সংখ্যা বেড়েছে ৯১ শতাংশ

একের পাতার পর

খাদ্যশস্য উৎপাদনে কি ঘাটতি হয়েছে? না। অতিমারির সময়েও উৎপাদন হয়েছে যথেষ্ট। সেই উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য বহুজাতিক কোম্পানির মুনাফার পণ্য হয়ে বহুমূল্যে বিকিয়েছে। কর্পোরেট ফুড কোম্পানিগুলির মুনাফা আকাশ ছুঁয়েছে, তাদের পুঁজি বিদেশের বাজারে জাঁকিয়ে বসেছে। কিন্তু সেই খাদ্য দরিদ্র শিশুদের মুখ পর্যন্ত পৌঁছয়নি।

অপুষ্টি দূর করতে শিশুদের প্রয়োজনীয় পরিমাণে দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, সবজি খাওয়ানো দরকার। অতিমারিতে বহু পরিবারে রোজগার নেই। সরকারের অপদার্থতা এবং খাদ্য-ব্যবসায়ীদের মজুতদারি-কালোবাজারিতে মূল্যবৃদ্ধি ভয়ঙ্কর আকার নিয়েছে। কয়েক গুণ বেড়ে গেছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম। সাধারণ মানুষের আয় কমায় ক্রয়ক্ষমতা কমেছে তিনগুণেরও বেশি। নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যও তারা কিনতে পারছে না। ফলে সুষম খাদ্য দূরের কথা, শিশুরা পেট ভরানোর খাবার থেকেও বঞ্চিত।

করোনার কারণে স্কুল বন্ধ। বন্ধ মিড-ডে মিল। মিড-ডে মিলে শিশুরা যেটুকু পুষ্টি পেত, তাও নেই। উপরন্তু শিশু-পুষ্টি ছিনিয়ে নিচ্ছে সরকার। ২০২০-র মার্চের সরকারি এক নির্দেশিকায় শিশুখাদ্য থেকে বাদ চলে গেছে ডিমের মতো পুষ্টিকর জিনিস। ডাল, সোয়াবিনও নামমাত্র। আইসিডিএস প্রকল্পেও বরাদ্দ ছিটেফোঁটা, প্রতি শিশুর জন্য সারা মাসে দু'কেজি চাল, দু'কিলো আলু আর তিনশো গ্রাম মুসুর ডাল। এখন আবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিও বন্ধ। অনেক হইচই-এর পর স্কুলে অভিভাবকদের সপ্তাহে একদিন ডেকে নামমাত্র কিছু খাবার দিতে শুরু করেছে সরকার। ফলে শিশুরা ভুগছে রক্তাল্পতায়। রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে না ওঠায় তারা সহজেই রোগাক্রান্ত হচ্ছে, তাদের বুদ্ধি ও চিন্তার বিকাশ স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে আগামী কয়েক প্রজন্ম পড়তে চলেছে ভয়াবহ সংকটের মুখে। কেন্দ্রীয় সরকারের এ সমস্ত অজানা নয়। কিন্তু তবু তারা কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না কেন? কারণ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি। তারা কর্পোরেট মালিকদের সেবায় দায়বদ্ধ, সাধারণ মানুষের প্রতি তাদের কোনও দায়িত্ববোধ নেই। তাই দেশের উপচে পড়া খাদ্যশস্য (চাল) সরকার মদ কোম্পানিগুলির হাতে তুলে দিলেও কিংবা এফসিআই-এর গোডাউনে থাকা চাল-গম সমুদ্রে ফেলে দিলেও তা গরিব জনসাধারণের মুখে পৌঁছয় না।

পুঁজিবাদী সমাজের রক্ষক সরকারগুলি তাদের তখত বাঁচাতে পুঁজি মালিকদের স্বার্থেই সমস্ত নীতি কার্যকর করে। সে জন্য পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের মতো বর্তমান বিজেপি সরকারেরও ভোটের দায় ছাড়া গরিবদের প্রতি কোনও দরদ নেই। তাই শিশুদের মর্মান্তিক এই পরিস্থিতি সত্ত্বেও গত পাঁচ বছর ধরে শিশুপুষ্টি সহ বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা খাতে অর্থবরাদ্দ ক্রমাগত কমিয়ে চলেছে বিজেপি সরকার। ২০২১-র বাজেটে আইসিডিএস প্রকল্পে বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে তারা। খাদ্য সুরক্ষার এত কথা বলেও রেশনকে সার্বজনীন করা এবং রেশন খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়নি। উল্টে গণবন্টন ব্যবস্থা অর্থাৎ রেশন যা দরিদ্র পরিবারগুলির কিছুটা ভরসা ছিল, তাও বন্ধ করার চক্রান্ত করছে বিজেপি সরকার। রাজ্য সরকারগুলিও চাল-গম বিতরণের মধ্য দিয়েই নিজেদের দায়িত্ব শেষ করেছে! ফলে শৈশব বঞ্চিত হচ্ছে খাদ্যের অধিকার থেকে।

সরকার প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট বাড়াচ্ছে, কিন্তু সমাজকল্যাণের মতো খাতে যেখানে সমাজের প্রান্তিক শিশুদের বেঁচে থাকার প্রশ্ন জড়িত তাতে বরাদ্দ করছে না। কাদের সুরক্ষা দিতে প্রতিরক্ষা বাজেট? দেশের এক শতাংশ ধনকুবেরদের। অতিমারির মধ্যেই ভারতে ১০০ কোটি টাকার সম্পদের মালিকের সংখ্যা ৫৮ থেকে বেড়ে ১১৩ হয়েছে। শিশুদের অপুষ্টির কারণ ধনকুবেরদের সম্পদ বৃদ্ধি। সরকার ঘনিষ্ঠ আদানি গোষ্ঠী খাদ্যের মজুতদারি করে তা অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করে যাতে বিপুল মুনাফা করতে পারে সে জন্যই সরকার অত্যন্ত জনবিরোধী তিনটি কালা কৃষি আইন এনেছে। যার বিরুদ্ধে এক বছর ধরে কৃষকরা লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। যদিও আদানি কর্তৃপক্ষ খাদ্য ব্যবসায় প্রবেশের কথা অস্বীকার করেছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই পাঞ্জাবে তাদের তৈরি খাদ্য ভাণ্ডারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে চাষিরা। বিজেপি সরকারের পরিকল্পনা, প্রথমে আদানি এবং সরকারি খাদ্য সংস্থা এফসিআই-এর যৌথ কার্যক্রম এবং ধীরে ধীরে সরকারের হাত গুটিয়ে নেওয়া। অর্থাৎ আদানি যাতে একচ্ছত্রভাবে এই ব্যবসার মালিক হতে পারে তার জন্য সবরকম সহযোগিতা করছে পুঁজিপতি-প্রেমী বিজেপি সরকার। সরকার হাত ধুয়ে ফেললে আর দেশের খাদ্য বাজার বহুজাতিক পুঁজি-মালিকদের মুনাফার মৃগয়া-ক্ষেত্রে পরিণত হলে শুধু শিশুরা নয়, কোনও সাধারণ মানুষই প্রয়োজনীয় খাদ্য পাবে না। কারণ, খাদ্য-ব্যবসায়ী আদানি কিংবা আম্বানি জনসাধারণের দিকে তাকিয়ে খাবারের দাম ঠিক করবে না। ফলে গরিব মানুষকে ঝাঁ চকচকে ফুড মার্টের শো-কেসের ভেতরে থাকা খাবার দেখেই 'পেট ভরাতে' হবে। সেই ভয়ঙ্কর দিনেরই পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে বর্তমানে। সরকারের এই মালিক তোষণ নীতির মোকাবিলা করা সম্ভব শক্তিশালী গণআন্দোলনের পথেই।

জীবনাবসান

পুরুলিয়া জেলার এস ইউ সি আই (সি) পাড়া লোকাল কমিটির বৈশ্যকুলি গ্রামে ৭ নভেম্বর দলের একনিষ্ঠ কর্মী কমরেড বিরূপাক্ষ ভট্টাচার্য দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। মৃত্যুর খবর পেয়ে এলাকার নেতা ও কর্মীরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য উপস্থিত হন।

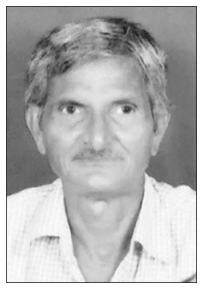

গত শতকের আশির দশকে বৈশ্যকুলি গ্রামের একদল ছাত্র-যুবক এস ইউ সি আই (সি)-র বৈপ্লবিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দলের সাথে যুক্ত হন। এঁদের উদ্যোগে ওই গ্রাম ও সংলগ্ন এলাকায় ছাত্র-যুবক এবং কৃষক-খেতমজুরদের সংগঠিত করে নানা দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের প্রক্রিয়াতেই প্রয়াত কমরেড বিরূপাক্ষ ভট্টাচার্য আশির দশকের শেষ দিকে দলের সাথে যুক্ত হন। প্রবল দারিদ্র্য এবং শাসক সিপিএমের বাধা ও ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে দলের কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তী সময়ে গ্রামীণ চিকিৎসকের পেশায় যুক্ত থাকার পাশাপাশি অত্যন্ত আবেগের সাথে দলের কাজে অংশগ্রহণ করতেন। গত কয়েক বছর ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে দলীয় কাজকর্ম সক্রিয় ভাবে করতে না পারলেও রোগযন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে গভীর আবেগের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন মূল্যবান কর্মীকে হারাল।

কমরেড বিরূপাক্ষ ভট্টাচার্য লাল সেলাম

পশ্চিম মেদিনীপুরে
বন্যাদুর্গতদের কনভেনশন

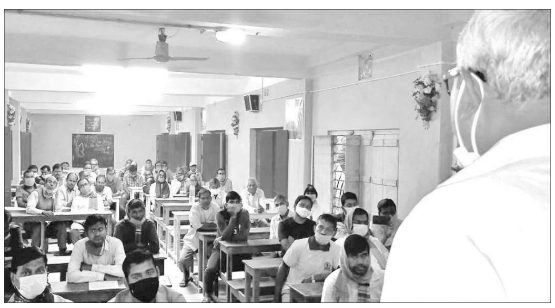

ঘাটাল থেকে গোপীগঞ্জ পর্যন্ত শিলাবতী ও রূপনারায়ণের নদীবাঁধকে মজবুত করা, ভেঙে যাওয়া স্লুইসগেটগুলিকে নতুন করে নির্মাণ করা ও মজে যাওয়া খালগুলি সংস্কার করে জলের পরিবহণ ক্ষমতা বাড়ানো প্রভৃতি দাবিতে ১৪ অক্টোবর শ্যামসুন্দরপুর রাজকুমার হাইস্কুলে একটি কনভেনশন করলেন হরিসিংহপুর, রত্নেশ্বরবাটি, প্রতাপপুর, হরিশপুর, শ্যামসুন্দরপুর, জোৎকানুরামগড়, রানিচক, কুড়ানি, গোপমহল প্রভৃতি বন্যাপ্রবণ এলাকার ভুক্তভোগী মানুষ।

প্রায় দুশো মানুষ এই কনভেনশনে যোগ দেন। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বলরাম জানা, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির যুগ্ম সম্পাদক দেবাশীষ মাইতি, নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, সহসভাপতি সত্যসাধন চক্রবর্তী, প্রাক্তন প্রধান বিশ্বজিৎ সিংহ, প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য সনাতন ঘোড়ই, কুশধ্বজ সামন্ত প্রমুখ। নারায়ণবাবু বলেন, সরকারি অবহেলার ফলে নদীর বাঁধ ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে, নদীর পাড়ে বিভিন্ন জায়গায় ধস নামছে, ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ছে, তা সত্ত্বেও সমস্যা সমাধানে সরকার কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

ধর্ষণকারীদের শাস্তির দাবি পরিচারিকাদের

৭ নভেম্বর খড়গপুর শহরের ওল্ড সেটলমেন্ট এলাকার এক মূক-বধির কিশোরীকে হাত-পা বেঁধে ধর্ষণ করে এক দুষ্কৃতী। এই বর্বরতার প্রতিবাদে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতি ৯ নভেম্বর খড়গপুর টাউন থানায় বিক্ষোভ দেখায়। অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দাবি করা হয়।

সমিতির পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক জয়শ্রী চক্রবর্তী বলেন, এ ধরনের ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ মদ এবং অশ্লীলতার ব্যাপক প্রসার। তিনি এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

সিভিক পুলিশের কদর্য আচরণের
তীব্র নিন্দা এস ইউ সি আই (সি)-র

৭ নভেম্বর রবীন্দ্র সদনের কাছে এক সিভিক পুলিশ যেভাবে সর্বসমক্ষে এক যুবককে রাস্তায় ফেলে বুকের উপর বুট সমেত পা তুলে চেপে ধরেছিল এবং যুবকটির কাতর অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও তাকে ছাড়ছিল না— তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এস ইউ সি আই (সি)। দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৯ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নামে পুলিশের এই আচরণ অত্যন্ত অমানবিক। গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন ছাড়াও পুলিশের অন্যান্য বেআইনি কাজের এটি এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পুলিশ কমিশনার দুঃখ প্রকাশ করলেও পুলিশমন্ত্রী এই অমানবিক এবং বেআইনি কাজের কোনও নিন্দা করেননি। আমরা অবিলম্বে দোষী সিভিক পুলিশের শাস্তি দাবি করছি এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের আচরণ যাতে আর ঘটতে না পারে তার জন্য গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকে প্রতিবাদে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রাথমিক স্তর থেকে স্কুল চালুর দাবিতে
সোচ্চার বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

প্রবল জনমতের চাপে ১৬ নভেম্বর নবম শ্রেণি থেকে স্কুল খুলছে। কিন্তু প্রাথমিক স্তর সামগ্রিক শিক্ষাক্ষেত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়া সত্ত্বেও তা খোলার ব্যাপারে সরকারের কোনও উচ্চবাচ্য নেই। দীর্ঘ প্রায় ২ বছর পড়াশোনা না চলায় বহু শিশু অক্ষরজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে বলে ইতিমধ্যে সমীক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে। রিপোর্ট বলছে, বহু শিশুর শিক্ষাজীবন ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে। এরকম এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও স্কুল চালু না হওয়ায় শিশুদের ভবিষ্যৎ শিক্ষার ভিত গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ভয়ানক ক্ষতি হবে। অবিলম্বে প্রাথমিক স্তর থেকে স্কুল চালু করবার দাবিতে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে ৮ নভেম্বর সারা বাংলা দাবি দিবস পালন করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি এবং হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার সহ রাজ্যের সমস্ত জেলার জেলাশাসক, ডি আই, চেয়ারম্যানদের ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ওই দিন সল্ট লেক করুণাময়ীতে বিকাশ ভবন থেকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন পর্যন্ত শিক্ষকদের মিছিল, মেদিনীপুর শহরে শিক্ষকদের অবস্থান এবং হাওড়া, বাঁকুড়া, বহরমপুর, সিউড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার শহরে প্রতিবাদী মিছিলের মাধ্যমে দাবি দিবস পালন করা হয়।

কলকাতা

মেদিনীপুর শহর

সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হাণ্ডা বলেন, ক্লাসের উপযোগী করার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ৬ হাজার স্কুলকে ১০৯ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এই টাকা প্রয়োজনের তুলনায় কম হলেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য এখনও পর্যন্ত কোনও অর্থ বরাদ্দ হয়নি। তিনি বলেন, অবিলম্বে প্রাথমিক স্তর থেকে পঠন-পাঠন চালুর ঘোষণা না হলে সমিতি বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে। নবান্ন ও উত্তরকন্যা অভিযানের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

হরিপুরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি স্থাপন

পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন-২ ব্লকের অন্তর্গত হরিপুর বাজারে হরিপুর বিদ্যাসাগর দ্বিশত জন্মবর্ষ উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপন করা হয়। উদ্বোধন করেন গড়হরিপুর গজেন্দ্র নারায়ণ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক দিলীপ মাইতি। প্রধান অতিথি ছিলেন দাঁতন বিধানসভার বিধায়ক বিক্রমচন্দ্র প্রধান।

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মূর্তির আবরণ উন্মোচন করে দিলীপ মাইতি তাঁর বক্তব্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন ও সংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করেন। কমিটির পক্ষ থেকে স্মরণিকা প্রকাশ ও উদ্ধৃতি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপস্থিত এলাকাবাসীর মধ্যে গভীর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

আগরতলা পৌরনিগম নির্বাচনে
এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীদের জয়ী করুন

২৫ নভেম্বর আগরতলা পৌরনিগম নির্বাচন। নির্বাচনে এস ইউ সি আই (সি) পাঁচটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। দলের রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড অরুণ ভৌমিক বলেন, ছোট প্রান্তিক রাজ্য ত্রিপুরাতেও মূল্যবৃদ্ধি, রোজগারহীনতা, অভাব-অনটনে জনজীবন বিপর্যস্ত। পৌর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এমন সময়ে যখন রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ অনুপস্থিত। জনজীবনের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুললে পুলিশি আক্রমণ এবং মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে কারারুদ্ধ করা অব্যাহত।

একদিকে করোনার অজুহাতে প্রশাসনিক বাধা, অন্যদিকে ভয় ও সন্ত্রাসের পরিবেশ। গত এক বছর ধরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পরিবর্তে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পৌর সংস্থাগুলি পরিচালনা করা হচ্ছে। পৌর নাগরিকদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা— বিশুদ্ধ ও পর্যাপ্ত পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, রাস্তা সংস্কার, আধুনিক শৌচালয়ের ব্যবস্থা, বাজার-হাট পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদির সুব্যবস্থা না করে পৌর এলাকা কেবল প্রসারিত করে চলছে। তদুপরি পরিষেবা প্রদানে প্রশাসনিক জটিলতায় নাগরিকদের ভোগান্তির শেষ নেই। নির্মাণ কাজে প্ল্যান পাশ করানো ব্যয়বহুল এবং অত্যন্ত জটিল। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর প্রাপকদের ঠিক সময়ে অর্থ প্রদান নিয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি, টুয়েফের কাজেও অনিয়ম। আগরতলা পৌর নিগমে ৫১টি ওয়ার্ড করা হয়েছে। পুরনো ওয়ার্ডগুলিতেই উপযুক্ত পরিষেবা নেই এবং নতুন ওয়ার্ডগুলিতে কোনও প্রকার পরিষেবা না দিয়েই কর আদায় শুরু হবে। এই অবস্থায় জনগণের মধ্যে অভিযোগ উঠছে যে পৌরনিগমে এনে তাঁদের কী লাভ হল? সরকার আগরতলা শহরকে স্মার্ট সিটি করার ঘোষণা করেছে অথচ অল্প বৃষ্টিতেই শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে যায়। এই নরকযন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি দিতে সরকারের কোনও মাস্টার প্ল্যানের কথা নাগরিকদের জানা নেই।

পৌর নিগমের প্রতিটি গলিতে ডাস্টবিন রাখা ও তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা নেই। নিগম অঞ্চলে পাবলিক টয়লেটের অভাবে জনগণের ভোগান্তির শেষ নেই। পর্যাপ্ত পরিমাণে জল সরবরাহ না থাকায় জনসাধারণকে বাধ্য হয়ে বহু টাকা ব্যয় করে নিজস্ব জলের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। অপেক্ষাকৃত উঁচু অঞ্চলে শুখা মরসুমে কুয়োতে জল থাকে না, তখন তীব্র জলসংকট দেখা দেয়। মশার উপদ্রব বন্ধ করতে মাঝে মধ্যে চেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু মশা নির্মূলীকরণের স্থায়ী কোনও ব্যবস্থা নেই।

সিপিএমের দীর্ঘ শাসনে এই অব্যবস্থাগুলির সমাধান যেমন হয়নি, তেমনি বর্তমান বিজেপি শাসনেও একই জিনিস চলছে। এমন পরিস্থিতিতে প্রকৃত বিরোধী শক্তি থাকা প্রয়োজন, যারা পৌর নিগমের ভিতরে নাগরিকদের স্বার্থে কথা বলবে এবং বাইরে তাদের সংগঠিত করে উপযুক্ত পরিষেবা প্রদানের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলবে। এস ইউ সি আই (সি) দল আন্দোলনের একটি শক্তি, যে দল সারা দেশব্যাপী জনস্বার্থে আন্দোলন পরিচালনা করে চলেছে ত্রিপুরা রাজ্যেও এই দল জনস্বার্থে শক্তি অনুযায়ী আন্দোলন করে আসছে এবং আগরতলা পৌর নিগমের বিভিন্ন সমস্যা নিয়েও আন্দোলন করছে। আগরতলা পৌর নিগম নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের ব্যাটারি টর্চ চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার জন্য নাগরিকদের কাছে আহ্বান জানান তিনি।

জনজীবনের দাবি নিয়ে সোচ্চার এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)

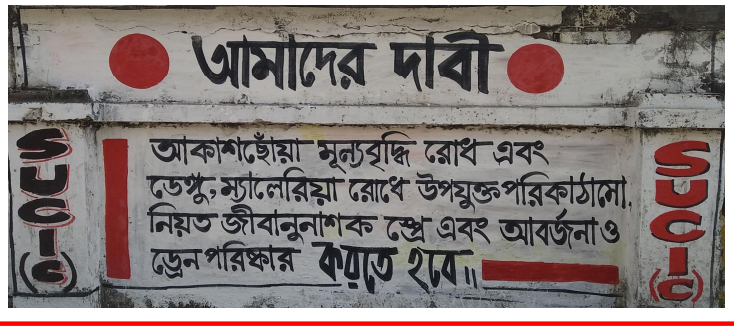

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com